بسم الله الرحمن الرحيم

# লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ মে ২০১৮, মোতাবেক ১১ হিজরত ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজকে আমি যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্ব প্রথমে রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ। তাঁর মা উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর ফুফু ছিলেন আর এভাবে তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর ফুপাত ভাই। মহানবী (সা.) দারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ, দার আল ফিকর, বৈরুতে ২০০৩ সনে মুদ্রিত)

দারে আরকাম হলো সেই স্থান বা কেন্দ্র, যা ছিল এক নবমুসলিম আরকাম বিন আরকামের বাসস্থান। এটি মক্কা থেকে কিছুটা বাইরে অবস্থিত ছিল। মুসলমানরা সেখানে সমবেত হত আর এটি ধর্ম শেখা এবং ইবাদত ইত্যাদির জন্য একটি কেন্দ্র ছিল। এই খ্যাতির কারণেই এর নাম 'দারুস সালাম' হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। মক্কায় এটি তিন বছর পর্যন্ত কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুসলমানরা সেখানে নীরবে ইবাদত করতো। এতে মহানবী (সা.)-এর বৈঠক বসত। হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা প্রকাশ্যে বাইরে বেরিয়ে আসে। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) ছিলেন এ কেন্দ্রে ইসলাম গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তি। [সীরাত খাতামান্নাবীঈন, রচয়িতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম. এ., পৃ. ১২৯]

যাহোক, এই জায়গাটি কেন্দ্রে রূপ নেয়ার পূর্বেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ইসলাম গ্রহণ করেন। বর্ণনা অনুসারে মুশরেক কুরাইশদের নির্যাতন এবং অত্যাচার থেকে তার বংশও নিরাপদ ছিল না। তিনি তার উভয় ভাই, হযরত আবু আহমদ এবং উবায়দুল্লাহ্ আর তার বোন হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ, হযরত উম্মে হাবীবা এবং হযরত হিমনা বিনতে জাহাশের সাথে দুইবার ইথিওপিয়ার দিকে হিজরত করেন। তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহ্ ইথিওপিয়া গিয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল আর সেখানেই খ্রিষ্টান অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার স্ত্রী অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের কন্যা হযরত উম্মে হাবীবা তখনো ইথিওপিয়াতেই ছিলেন আর তখন মহানবী (সা.) তাকে বিয়ে করেন। (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ, দারুল ফিকর, বৈরুতে ২০০৩ সনে মুদ্রিত)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ মদীনায় হিজরতের পূর্বে ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় আসেন। এখান থেকে তাঁর গোত্র বনু গানামে, দুদানের সবাইকে (এরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল) সাথে নিয়ে মদীনায় চলে যান। তিনি মক্কাকে এমনভাবে আত্মীয়স্বজনশূণ্য করে দেন যে পাড়ার পর পাড়া (জনশূণ্যতার কারণে) সৌন্দর্য হারিয়ে বসে আর অনেক

বাড়ি বন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে। (আত্তাবাকাতুর কুবরা, লেইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ, দার আহইয়ায়ুত তারাসিল আরাবী বৈরুতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)

পাকিস্তানের কোন কোন স্থানে আহমদীদের সাথে আজকাল এই অবস্থাই হচ্ছে। কোন কোন গ্রাম খালি হয়ে গেছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, বনু জাহাশ বিন রেয়াব যখন মক্কা থেকে হিজরত করে তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব তাদের ঘরবাড়ি আমর বিন আলকামার কাছে বিক্রি করে দেয়। মদীনায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের কাছে এই সংবাদ পৌঁছার পর তিনি তা মহানবী (সা.)-এর কাছে উল্লেখ করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আব্দুল্লাহ্! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, এর বিনিময়ে খোদা তোমাকে জান্নাতে প্রাসাদ দেবেন? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এতে সন্তুষ্ট। তখন তিনি (সা.) বলেন, তাহলে (নিশ্চিত থাক) সেই প্রাসাদ তোমার জন্য অবধারিত। [সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৫২, বাব হিজরাতুর রাসূল (সা.), দারুল কুতুবুল আলামিয়া, বৈরুতে ২০০১ সনে মুদ্রিত] অর্থাৎ যে ঘরবাড়ি তুমি ছেড়ে এসেছ এর বিনিময়ে তুমি জান্নাতে স্থান পাবে এবং সেখানে প্রাসাদ নির্মিত হবে।

মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে নাখলা উপত্যকার দিকে এক সেনা অভিযানে প্রেরণ করেন। বিভিন্ন পুস্তকে এর উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, রসূলে করীম (সা.) একদিন এশার নামায শেষ করার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে বলেন, প্রভাতে তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসবে, তোমাকে এক জায়গায় পাঠাব। অতএব, হুযূর (সা.) ফযরের নামায শেষ করার পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশকে তার তির ও তূণ এবং বর্শা ও বর্মে সজ্জিত অবস্থায়নিজের ঘরের দরজায় অপেক্ষমান দেখতে পান। মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কাবকে ডেকে পাঠান এবং তাকে এক পত্র লেখার নির্দেশ দেন। সেই পত্র লেখা সম্পন্ন হলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে ডেকে সেই পত্রটি তাকে দিয়ে তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাকে এই বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করছি। অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে যে দলটি পাঠানো হয়েছিল (সেই বাহিনীর কথা হচ্ছে)। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, এর পূর্বে তিনি এই জামা'তের দায়িত্বে হযরত উবায়দা বিন হারেছকে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু যাত্রার পূর্বে তিনি যখন বিদায়ের জন্য বাড়ি যান তখন তার সন্তানরা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করে। একারণে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে তার পরিবর্তে আমীর নিযুক্ত করে পাঠান। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে পাঠানোর সময় মহানবী (সা.) তার উপাধি রেখেছেন আমীরুল মু'মিনীন, সীরাতুল হালবিয়াতে এটি লেখা রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী যুগে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশই সেই সর্বপ্রথম সৌভাগ্যবান সাহাবী যার জন্য আমীরুল মু'মিনীন উপাধি নির্ধারণ করা হয়েছে। (আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭, সারিয়াতু আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ ইলা বাতনে নাখলা, দারুল কুতুবুল আলামিয়া, বৈরুতে ২০০২ সনে মুদ্রিত)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেন যে,

মহানবী (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার পরও মক্কাবাসীর ক্রোধের মাত্রা কমেনি বরং তারা মদীনাবাসীদের হুমকিধমকি দিয়ে বলে, তোমরা যেহেতু আমাদের লোকদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছ তাই তোমাদের জন্য এখন একটি রাস্তাই খোলা আছে, হয় এদের সবাইকে হত্যা কর আর না হয় তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দাও। অন্যথায় আমরা কসম খেয়ে বলছি যে, আমরা মদীনায় হামলা করব আর তোমাদের সবাইকে হত্যা করে তোমাদের মহিলাদের করায়ত্ব করে নিব। তারা শুধু হুমকি-ধমকি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং মদীনায় হামলা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়াও আরম্ভ করে। সেই যুগে মহানবী (সা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, অনেক সময় তিনি সারা রাত জেগে কাটাতেন। একইভাবে সাহাবীরা রাতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘুমাতেন, এ আশংকায় যে রাতের অন্ধকারে শত্রু আবার কোথাও হঠাৎ হামলা না করে বসে। এমতাবস্থায় রসূলে করীম (সা.) একদিকে মদীনার চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্রের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ করেন যে, যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে তারা মুসলমানের সঙ্গ দিবে। অপর দিকে কুরাইশরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে- এসব সংবাদের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) হিজরতের দ্বিতীয় বছরে আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে বারো জন লোকের সাথে নাখলা প্রেরণ করেন আর তাকে একটি পত্র দিয়ে বলেন, এ পত্রটি যেন দু'দিন পর খোলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ দুদিন পর সেই পত্র খুলেন, তাতে লেখা ছিল, তুমি নাখলায় অবস্থান কর আর কুরাইশের গতিবিধি অবগত হয়ে আমাদেরকে তা অবহিত কর। ঘটনাচক্রে কুরাইশের একটি ছোট্ট দল সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে ফিরে আসছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত করে তাদের ওপর হামলা করে বসেন। এর ফলে একজন কাফির আমর বিন আল হাজরামী নিহত হয় এবং দু'জন গ্রেফতার হয় আরমালে গণিমতও মুসলমানেরা করায়ত্ব করে নেয়। মদীনায় ফিরে এসে তিনি যখন মহানবী (সা.)-কে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন তখন তিনি (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেই নি আর 'মালে গণিমত' গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানান।

ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাসের বরাতে লিখেন যে, "হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং তার সাথিরা যে ভুল করেছে তা হলো, রজব মাস আরম্ভ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ধরে নিয়েছিল রজব মাস তখনো আরম্ভ হয় নি। তারা ধরে নিয়েছিল, এটি ত্রিশ জমাদিউস সানী, রজব মাস এখনো আরম্ভ হয় নি। যাহোক মুসলমানদের হাতে আমর বিন হাজরামী নিহত হওয়ার কারণে পৌত্তলিকেরা হৈচৈ আরম্ভ করে দেয় আর বলে, মুসলমানরা এসব পবিত্র মাসের পবিত্রতার প্রতিও অশ্রদ্ধাশীল যাতে সকল প্রকার যুদ্ধ বন্ধ থাকত।" হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে এ আপত্তিরই খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, নিঃসন্দেহে এই মাসগুলোতে যুদ্ধ করা খুবই অপছন্দনীয় কাজ এবং খোদার দৃষ্টিতে পাপ। কিন্তু এর চেয়েও ঘৃণ্য বিষয় হলো মানুষকে খোদার পথ হতে বিরত রাখা, আল্লাহ্‌র তৌহিদকে অস্বীকার করা আর মসজিদে হারামের সম্মানকে পদদলিত করা এবং এর অধিবাসীদেরকে বিনা দোষে শুধু এই জন্য তাদের ঘর থেকে বহিষ্কার করা যে, তারা আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান এনেছে। একটি কথা তোমাদের মনে পড়ল কিন্তু এই কথা

চিন্তা কর নি যে, তোমরা নিজেরা কত বড় অপরাধ করছ। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করে আর মসজিদে হারামের সম্মান পদদলিত করে এর অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে কত অপছন্দনীয় কাজ করেছ! যেখানে তোমরা নিজেরাই এসব অপকর্মে লিপ্ত হয়েছো, সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন মুখে তোমরা আপত্তি করছ? এরা তো না জেনে একটি ভুল করেছে কিন্তু তোমরা তো জেনেবুঝে পরিকল্পিতভাবে এসব কিছু করছ। (তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫, সূরা বাকারা ২১৮)

বুখারীর একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ শাহ্ সাহেব সরীয়্যা (যুদ্ধাভিযান) আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের ইতিবাচক ফলাফলের উল্লেখ করতে গিয়ে এর ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, ঘটনা প্রবাহে প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রতিনিধি দলকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল তাতে তারা পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছেন আর তারা বন্দীদের মাধ্যমে মক্কার কুরাইশদের ষড়যন্ত্র এরং তাদের গতিবিধি সম্পর্কেও নিশ্চিত সংবাদ অবগত হয়েছেন। হাজরামীর কাফেলা-সংক্রান্ত ঘটনাটি একটি কাকতালীয় এবং দৈব ঘটনা ছিল। এই অভিযানে কতক সদস্যের মনে মুহাজেরদের হারানো ধনসম্পত্তির উদ্ধারের মনোবৃত্তির উদ্রেক হয়েছিল মর্মে কোন কোন ইতিহাসবিদ যে মতামত ব্যক্ত করে, তা সঠিক নয়। বরং এই অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হাজরামী-সংক্রান্ত কাফেলার মাধ্যম আবু সুফিয়ান বিন হারবের নেতৃত্বে পরিচালিত কাফেলার উদ্দেশ্য এবং মক্কার কুরাইশের যুদ্ধ সম্পর্কিত ষড়যন্ত্রের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন আর গোপনে এই দায়িত্বই তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। একারণেই তারা এই ছোট্ট কাফেলাকে ধরে নিয়ে আসার সুযোগ হাতছাড়া করে নি। এটি একটি অবাস্তব ধারণা যে, তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল মক্কার কুরাইশদের যুদ্ধের প্রস্তুতি–সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য কিন্তু তারা কাফেলাকে লুটে মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসাকে যথেষ্ট মনে করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ খুবই উচ্চমার্গের একজন সাহাবী ছিলেন আর রসূলে করীম (সা.)-এর ফুপাতো ভাইও ছিলেন। তিনি (সা.) একজন বিশ্বস্ত ও গোপনীয়তা রক্ষাকারী ব্যক্তিকে এই অভিযানের জন্য বেছে নিয়েছেন। রসূলে করীম (সা.) যখন মক্কার কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনিও প্রস্তুতি আরম্ভ করেন আর এ প্রস্তুতিতে তিনি পুরো গোপনীয়তা রক্ষা করেন। (সহীহ বুখারী, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫, কিতাবুল মাগাযি, বাব কিচ্ছা গাযওয়া বদর, জিয়াউল ইসলাম প্রেস, রাবওয়ায় মুদ্রিত)

তিনি লিখেছেন, মাগাযিতে (যুদ্ধের ইতিহাসে) এমন ঘটনাবলী এসেই থাকে অর্থাৎ যুদ্ধের বিবরণে এমন কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে, মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং তার সাথিদের প্রতি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই অসন্তোষ এদিক থেকে যুক্তিযুক্ত ছিল অর্থাৎ তাদের অভিযানে এমন অবস্থা দেখা দিয়েছিল যা নৈরাজ্যের কারণ হতে পারত। কিন্তু অনেক সময় কিছু বিষয় বাহ্যত ভুল মনে হলেও তা ঐশী ইচ্ছার অধীনে ঘটে থাকে আর কিছু কিছু ছোট ঘটনা অসাধারণ ফলাফলে পর্যবসিত হয়। তাই হযরত আব্দুল্লাহ্বিন জাহাশের নেতৃত্বাধীন অভিযান যদি হাতে না নেয়া হতো এবং তাদের দ্বারা যা কিছু ঘটেছে তা না ঘটত আর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে আগত বাণিজ্য

কাফেলা নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে যেত তাহলে কুরাইশরা সেই বাণিজ্য কাফেলাকে কাজে লাগিয়ে অনেক বড় প্রস্তুতির সাথে মুসলমানদের ওপর হামলা করার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, যার মুখোমুখি হওয়া সহায়সম্বলহীন সাহাবীদের জন্য অসম্ভব ছিল। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ-সংক্রান্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে কুরাইশের অহংকারী নেত্রীবৃন্দ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে আর এ রাগ ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে তড়িঘড়ি করে প্রায় এক হাজার সশস্ত্র সেনবাহিনী নিয়ে নিজেদের কাফেলা রক্ষার মানসে বদর প্রান্তরে এসে উপস্থিত হয়। তারা এটি জানত না যে, সেখানেই তাদের মৃত্যু অবধারিত। অপর দিকে এই আশঙ্কাও ছিল যে, সাহাবীরা যদি জানতে পারতেন , একটি সশস্ত্র সেনাবাহিনীর মোকাবিলার জন্য তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে তাদের কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যেত। তাই গোপনীয়তা সেই কাজ করেছে, যা আধুনিক যুদ্ধে এমন আত্মরক্ষাব্যূহ দিয়ে থাকে, যুদ্ধের পরিভাষায় যাকে ছদ্মবেশ বা ক্যামোফ্ল্যাজ বলা হয়ে থাকে"। (সহীহ বুখারী, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৭, কিতাবুল মাগাযি, বাব কিচ্ছা গাযওয়া বদর, জিয়াউল ইসলাম প্রেস, রাবওয়ায় মুদ্রিত)

ইতিহাসে লেখা আছে, খোদা এবং রসূলপ্রেম তাদেরকে জগতের প্রতি উদাসীন করে রেখেছিল। তাদের একমাত্র বাসনা ছিল,তাদের প্রিয় জীবন যেন কোনভাবে খোদার পথে উৎসর্গ হয়ে যায়। তাদের এ বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আর **আল-মুজাদ্দাউ ফিল্লাহ্** (খোদার পথে কানকাটা) তাদের নামের এক স্বতন্ত্র প্রতীক হয়ে আছে। (উসুদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯০, আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, অর্থাৎ তার দোয়া কীভাবে গৃহীত হতো- এ প্রেক্ষাপটে তার শাহাদতের পূর্বের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। ইসহাক বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আমার পিতা অর্থাৎ সা'দ-কে ওহুদের যুদ্ধের দিন বলেন, এসো! খোদার কাছে দোয়া করি। তারা উভয়ে এক পাশে চলে যান, প্রথমে সাদ দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আগামীকাল আমি যখন শত্রুর আমি মুখোমুখি হই, তখন আমি যেন এমন ব্যক্তির মুখোমুখি হই, যে আক্রমণে হবে কঠোর এবং প্রতাপান্বিতও আর আমি যেন তার সাথে যুদ্ধ করে তোমার খাতিরে তাকে হত্যা করতে পারি আর তার অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করতে পারি, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ 'আমীন' বলেন। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! আগামীকাল আমার সামনে যেন এমন ব্যক্তি আসে যে হবে আক্রমণে কঠোর ও খুবই প্রতাপান্বিত, তার সাথে আমি যেন তোমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করি আর সেও যেন আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অধিকন্তু সে জয়যুক্ত হয়ে আমাকে যেন হত্যা করে আর আমাকে ধরে আমার নাক এবং কান কেটে ফেলে। আর আমি যখন তোমার দরবারে উপস্থিত হব তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আব্দুল্লাহ্! কার খাতিরে তোমার নাক এবং উভয় কান কর্তিত হয়েছে? তখন আমি বলব, তোমার এবং তোমার রসূল (সা.)-এর পথে। প্রত্যুত্তরে তুমি বলবে, তুমি সত্য বলেছ। হযরত সা'দ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের এই দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উন্নত ছিল। কেননা, আমি শেষ দিন দেখেছি তার নাক এবং উভয় কান একটি সুতোয় গেঁথে ঝুলিয়ে

রাখা হয়েছিল। (উসুদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯০ আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) অর্থাৎ এগুলো কর্তিত ছিল এবং গেঁথে রাখা হয়েছিল।

এই পাশবিক কার্যকলাপ করত কাফেররা আর আজকাল কতক কট্টরপন্থী মুসলমানও ইসলামের নামে এটিই করছে।

হযরত মুত্তালেব বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হান্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেদিন ওহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সেদিন তিনি (সা.) শেখাইন নামে মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় রাত্রি যাপন করেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) ছাগলের একটি ভুনা পা আনেন, যা থেকে মহানবী (সা.) আহার করেন। একইভাবে নবীজ বা ছাতুর সরবত আনা হলে তিনি (সা.) তাও পান করেন। আমার মনে হয় এটি এক প্রকার পানীয় হবে। এরপর এক ব্যক্তি শরবতের সেই পেয়ালা নিয়ে যায় এবং তা থেকে কিছুটা পান করে। এরপর সেই পেয়ালা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ নেন এবং পুরোটাই পান করে ফেলেন। এক ব্যক্তি বলেন, কিছুটা আমাকেও দাও। তুমি কি জান, আগামীকাল প্রভাতে তুমি কোথায় যাবে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ বলেন, হ্যাঁ, আমি জানি। আল্লাহ্র সাথে পিপাসার্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ করার চেয়ে পরিতৃপ্ত অবস্থায় মিলিত হওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০, ওয়া মিন বনী হুলাফা বনী শামস... ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

খোদা তা'লাকে ভালোবাসার অদ্ভুত রীতি ছিল সাহাবীদের আর এর জন্য তাদের প্রস্তুতির ধরনও অভিনব।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং হযরত হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিবকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। হযরত হামজা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের খালু ছিলেন। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল চল্লিশের কিছুটা বেশী। মহানবী (সা.) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওলী হন এবং তার পুত্রকে খায়বারে সম্পদ ক্রয় করে দেন। (উসুদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯০, আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ সুচিন্তিত এবং সঠিক মতামত ব্যক্ত করার দক্ষতা রাখতেন। মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে যেসব সাহাবীদের কাছে পরামর্শ নিয়েছেন তাদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (আল-ইস্তিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬, আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের বোনের একটা ঘটনা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন, যা ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'আমরা জানি যে এ যুদ্ধে অর্থাৎ ওহুদের যুদ্ধে, মহানবী (সা.) কেমন দৃঢ় মনোবল এবং উন্নত আখলাকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের মন জয় করেছেন। এ যুদ্ধ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি নৈতিক চরিত্রের কত মহান মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন আর এই যুদ্ধে সাহাবীদের অভূতপূর্ব ত্যাগের ঘটনাও সামনে আসে। তিনি বলেন, আমি সেই সময়কার কথা বলছি যখন যুদ্ধ শেষে তিনি মদীনায় ফিরে আসছিলেন, মদীনার যেসব মহিলা তার শাহাদতের

ঘটনা শুনে ব্যাকুল ছিলেন, এখন তারা তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য মদীনা থেকে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন তার শ্যালিকা জয়নব হিমনাহ্ বিনতে জাহাশ। তার খুবই কাছের তিনজন আত্মীয় যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, 'তোমার প্রয়াত আত্মীয়দের জন্য কাঁদো বা আফসোস কর'। এটি একটি আরবী বাগধারা, এর অর্থ হলো আমি তোমাকে দুঃসংবাদ দিচ্ছি, তোমার প্রিয়জন মারা গেছেন। হিমনাহ্ বিনতে জাহাশ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোন মৃত আত্মীয়ের জন্য ক্রন্দন করব? তিনি বলেন, তোমার মামা হামজা শাহাদত বরণ করেছেন। এটি শুনে হযরত হিমনা বলেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ এরপর বলেন, খোদা তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, কতই না উত্তম মৃত্যু তিনি বরণ করেছেন! মহানবী (সা.) আবার বলেন, তোমার আরেক প্রয়াত আত্মীয়ের জন্য ক্রন্দন কর। হিমনাহ্ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কার জন্য? তিনি বলেন, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশও শাহাদত বরণ করেছেন। হিমনাহ্ পুনরায় إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়েন এবং বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ তারতো খুবই ভালো মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, হিমনাহ্! তোমার আরেক প্রয়াত আত্মীয়ের জন্য তুমি ক্রন্দন কর। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কার জন্য? তিনি বলেন, তোমার স্বামীও শাহাদত বরণ করেছেন। এটি শুনে হযরত হিমনাহ্‌র চোখ থেকে অশ্রুধারা নেমে আসে আর তিনি বলেন, হায় পরিতাপ! এটি দেখে মহানবী (সা.) বলেন, দেখ! এক মহিলার তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক কত গভীর হয়ে থাকে। আমি হিমনাহ্ যখন তার মামার শাহাদাতের সংবাদ দিলাম তখন সে বলল, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আমি যখন তাকে তার ভাইয়ের শাহাদতের সংবাদ দেই সে পুনরায় إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ে, কিন্তু যখন আমি তাকে তার স্বামীর শাহাদতের সংবাদ দেই তখন সে আক্ষেপ করে বলে, হায় পরিতাপ, আর সে তার অশ্রু সংবরণ করতে পারে নি আর ঘাবড়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, মহিলা এমন সময় সবচেয়ে প্রিয় এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কেও ভুলে যায় কিন্তু স্বামী, যে তাকে ভালোবাসে তার কথা মনে থাকে। এরপর তিনি হিমনাহ্‌কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে হায় পরিতাপ! কেন বললে? হিমনাহ্ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তখন আমার তার সন্তানের কথা মনে পড়ে যায়, এখন কে তাদের দেখাশোনা করবে?'

এখানে স্বামীর ভালোবাসা নিজের জায়গায় সত্য। যদি এমন স্বামী হয়ে থাকে যে ভালবাসে, তাহলে স্ত্রীও তাকে স্মরণ রাখে। কিন্তু তিনি সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন আর এরই তিনি বহিঃপ্রকাশ করেছেন। এতে অধুনাকালের পুরুষ ও মহিলাদের জন্যও শিক্ষনীয় দিক রয়েছে। অর্থাৎ স্বামীদের এমন হওয়া উচিত যারা স্ত্রীদের ভালবাসবে আর মায়েদের এমন হওয়া উচিত যারা সন্তানদের বিষয়ে হবে সচেতন ও যত্নবান। এমন স্বামী যদি হতে হয় তাহলে স্ত্রী–সন্তানের প্রাপ্য প্রদান করা আবশ্যক, যে বিষয়ে আজকাল অনেক অভিযোগ আসে যে, অধিকার দেয়া হচ্ছে না।

দেখুন! এরপর মহনবী (সা.)ও কত সুন্দর মন্তব্য করেছেন!) 'তিনি হিমনাহ্‌কে বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি তিনি যেন তোমার স্বামীর চেয়ে অধিক

যত্নবান কোন ব্যক্তি দাঁড় করিয়ে দেন। অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রতি যত্নবান উত্তম কোন ব্যক্তি যেন দণ্ডায়মান হন। এই দোয়ার ফলশ্রুতিতেই হযরত হিমনার এর বিয়ে হযরত তালহার সাথে হয় আর তাঁর ঘরে মুহাম্মদ বিন তালহার জন্ম হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, তালহা তার নিজের পুত্র মুহাম্মদের প্রতি ততটা ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রদর্শন করতেন না যতটা হিমনাহ্‌র পূর্বের সন্তানদের প্রতি প্রদর্শন করতেন। মানুষ বলতো, অন্যের সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তালহার চেয়ে উত্তম কেউ নেই। এটি মহানবী (সা.)-এর দোয়ারই ফসল ছিল। ('মাসায়েব কে নিচে বারকাতোঁ কে খাযানে মাখফী হোতে হেঁ'-আনওয়ারুল উলূম, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭)

দ্বিতীয় সাহাবী, যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি হলেন, হযরত কাব বিন জায়েদ। তাঁর নাম হলো কাব বিন জায়েদ বিন কায়েস বিন মালেক। বনু নাজ্জারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। হযরত কাব (রা.) বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন আর পরিখার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। বলা হয় উমাইয়া বিন রাবিয়া বিন সাখ্‌খারের নিক্ষিপ্ত তির লেগেছিল তার গায়ে। তিনি বে'রে মাওনার (অভিযানে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীদের একজন ছিলেন যেখানে তার সব সাথি শাহাদত বরণ করেন, কেবল তিনিই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। (আল ইস্তিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

বে'রে মাওনা সেই জায়গা, যেখানে মহানবী (সা.) এক গোত্রের অনুরোধে তাঁর সত্তর জন সাহাবীকে প্রেরণ করেছিলেন, যাদের অনেকেই ছিলেন কুরআনের হাফেজ এবং ক্বারী। তারা প্রতারণামূলকভাবে তাদের সবাইকে শহীদ করে, শুধু হযরত কাব ব্যতীত। আর হযরত কাবও বে'রে মাওনার এই ঘটনায় রক্ষা পান, কারণ তিনি তখন পাহাড়ে চড়ে যান। কোন কোন বর্ণনানুসারে কাফেররা আক্রমণ করে তাকেও গুরুতরভাবে আহত করে এবং তাকে মৃত মনে করে রেখে চলে যায়। কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন আর কয়েক দিনের মধ্যে মদীনায় ফিরে আসেন, যাহোক এরপর তিনি জীবন ফিরে পান এবং সুস্থ হয়ে উঠেন। [হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন আহমদ এম. এ. (রা.) রচিত সীরাতে খাতামান নবীঈন, পৃ. ৫১৮-৫১৯]

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হবে হযরত সালেহ্ শুকরান (রা.)-এর। তাঁর নাম ছিল সালেহ্ আর উপাধী ছিল শুকরান এবং এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। হযরত সালেহ্ শুকরান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আউফের ইথিওপিয়ান ক্রীতদাস ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নিজের সেবার জন্য পছন্দ করেন আর টাকার বিনিময়ে হযরত আব্দুর রহমানের কাছ থেকে তাকে ক্রয় করেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ তাকে বিনামূল্যে মহানবী (সা.)-কে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করেন। (উসুদুল গাবা ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২, শুকরান ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত সালেহ্ শুকরান বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি যেহেতু তখনো ক্রীতদাস ছিলেন, স্বাধীনতা পান নি, তাই মহানবী (সা.) তার জন্য মালে গনিমতের কোন অংশ নির্ধারণ করেন নি। মহানবী (সা.) সালেহ্ শুকরানকে বন্দীদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত সালেহ্ শুকরান যাদের বন্দীদের দেখাশুনা করতেন বিনিময়ে তারাই তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করত, এভাবে তিনি মালে গনিমতের চেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করেন।

(সীরাতে ইবনে কাসীর, বাবু যিকরে উবায়দা, পৃ. ৭৫০, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) অর্থাৎ মালে গনিমতের অংশ পান নি ঠিকই কিন্তু এই তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতিতে মালে গনিমতের চেয়েও বেশি সম্পদ লাভ করেন। বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দেন। (উসুদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২, শুকরান, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ সাদেক বলেন, হযরত শুকরান আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (হিইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮, যিকরু আহলিস্ সুফ্ফা, ২০০৭ সনে মাকতাবাতুল ঈমান আল-মনসূরাহ হতে মুদ্রিত) অর্থাৎ তিনি তাদের একজন ছিলেন, যারা সব সময় মহানবী (সা.)-এর দরজার পাশে বসে থাকতেন। হযরত শুকরানের আরেকটি সৌভাগ্য হয়েছে আর তা হলো, মহানবী (সা.) কে গোসল দেয়া এবং তাঁর দাফন-কাফনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। (আল-ইসাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪, শুকরান, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, মহানবী (সা.)-কে তাঁর পরিধেয় কাপড়েই গোসল দেয়া হয়েছে আর তাঁর কবরে হযরত আলী, হযরত ফযল বিন আব্বাস, হযরত কুসাম বিন আব্বাস, হযরত শুকরান এবং অওস বিন খাওয়ালী নেমেছিলেন। (আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৪ হাদীস-৭১৪৩, জিমাউ আবওয়াবিত তাকবীর আলাল জানায়েয... ২০০৪ সনে মাকতাবাহ আর-রশীদ রিয়াদ হতে মুদ্রিত)

হযরত শুকরান এ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম, আমিই কবরে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দেহের নিচে মখমলের চাদর বিছিয়েছিলাম। (সুনান আত-তিরমিযী, কিতাবুল জানায়েয, বাবু মা জাআ ফিস-সাওবিল ওয়াহিদ... হাদীস ১০৪৭)

মুসলিম শরীফের রেওয়াত অনুসারে তা লাল রঙের মখমলের চাদর ছিল। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাবু জা'লিল কাতীফাহ্ ফিল-কাবরি, হাদীস-২২৪১) এটি সেই চাদর ছিল যা রসূলে করীম (সা.) ব্যবহার করতেন। সুতরাং হযরত শুকরান বলতেন, আমি পছন্দ করি নি, মুহাম্মদ (সা.)-এর পর অন্য কোন ব্যক্তি এই চাদর পরবে, কেননা তিনি (সা.) এই চাদর গায়েও চড়াতেন আবার বিছাতেনও। (ইমাম নভী রচিত আল-মিনহাজ বিশারহি সাহীহ্ মুসলিম পৃ. ৭৪৯, কিতাবুল জানায়েয বাবু জা'লিল কাতীফাহ্ ফিল-কাবরি, হাদীস-৯৬৭, ২০০২ সনে দার ইবনে হিযাম হতে মুদ্রিত)

মুরইয়াসির যুদ্ধের সময় বন্দিদের কাছ থেকে এবং মুরইয়াসির অধিবাসীদের ক্যাম্প থেকে যে ধনসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ও গবাদি পশু ইত্যাদি হস্তগত হয়েছিল সেগুলোর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মহানবী (সা.) হযরত শুকরান (রা.)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। (ইমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৬, ফাসলে ফি যিকরে মাউলা রাসূলুল্লা সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, ১৯৯৯ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) এদৃষ্টিকোণ থেকে তিনি খুবই বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর সম্পর্কে উল্লিখিত রয়েছে হযরত শুকরানের পুত্র আব্দুর রহমান বিন শুকরানকে হযরত আবু মূসা আশআরীর কাছে হযরত উমর (রা.) এই মর্মে পত্রসহ পাঠান যে, আমি তোমার কাছে এক পুণ্যবান ব্যক্তি হযরত আব্দুর রহমান বিন সালেহ্ শুকরানকে পাঠাচ্ছি, যিনি মহানবী (সা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত

ক্রীতদাস ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দৃষ্টিতে তার পিতার পদমর্যাদাকে সামনে রেখে তাঁর সাথে ব্যবহার করবে। (আস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫, আব্দুর রহমান বিন শুকরান, ২০০৫ সালে বৈরুতে মুদ্রিত)

এটি ছিল সেই পদমর্যাদা যা ইসলাম ক্রীতদাসদের দিয়েছে। অর্থাৎ শুধু দাসত্বের শৃঙ্খল থেকেই মুক্ত করে নি বরং তাদের সন্তানসন্ততিও সম্মানিত গণ্য হয়েছেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত শুকরান মদীনায় বসতি স্থাপন করেছিলেন আর বসরাতেও তার একটি বাড়ি ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়। (আস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৫, শুকরান রা. ২০০৫ সালে বৈরুতে মুদ্রিত) (ইমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩১৬, ফাযলে ফি যিকরে মাওলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, ১৯৯৯ সালে বৈরুতে মুদ্রিত)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত মালিক বিন দুখশুম এর। তাঁর সম্পর্ক খাজরাজ গোত্রের বনু গানাম বিন আউফের সাথে ছিল। ফুরিয়াহ নামে তার এক কন্যা সন্তান ছিল। (ইত্তেবাকাতুল কিবরিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮২, মালেক বিন আদ্ দুখশুম, ১৯৯৬ সালে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত মালেক বিন আদ্ দুখশুম (রা.) আকাবার বয়আতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কি-না এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে ইসহাক এবং মূসা বিন উকবার মতে আকাবার বয়আতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, আলেমদের বিতর্ক চলতেই থাকে। হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.) বদর, ওহুদ, খন্দক এবং এর পরের সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী এবং বাহনসঙ্গী ছিলেন। (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৫-৪০৬, মালেক বিন আদ্ দুখশুম, ২০০২ সালে বৈরুতে মুদ্রিত)

কুরাইশের বড় এবং সম্মানিত নেত্রীবৃন্দের একজন ছিলেন সাহিল বিন আমর। তিনি বদরের যুদ্ধে মুশরেকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে যোগ দেন, আর তাকে হযরত মালেক বিন দুখশুম বন্দী করেন।

ঘটনার বর্ণনানুসারে আমের বিন সাদ তার পিতা হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, "আমি বদরের যুদ্ধের দিন সোহাইল বিন আমরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করি,যার ফলে তার রগ কেটে যায়। এরপর আমি বহমান রক্তের চিহ্ন দেখে অগ্রসর হতে থাকি। আমি দেখলাম, হযরত মালেক বিন দুখশুম তার কপালের চুল ধরে রেখেছেন। আমি বললাম, সে আমার বন্দী, আমি তাকে তীর মেরেছি। কিন্তু হযরত মালেক বলেন, সে আমার বন্দী, আমি তাকে ধরেছি। পরে তাদের উভয়ে তাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) সোহাইলকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেন আর রৌহা নামক স্থানে সোহাইল, হযরত মালেক বিন দুখশুমের হাত থেকে ফসকে যায়। হযরত মালেক উচ্চস্বরে মানুষকে ডাকেন এবং তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। মহানবী (সা.) তখন বলেন, যে-ই তাকে পায়, তাকে যেন হত্যা করে। যুদ্ধের জন্য এসেছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এরপর ধরা পড়ে আর বন্দি অবস্থা থেকে পালিয়ে যায়, পুনরায় মুসলমানদের ক্ষতি করার আশঙ্কা ছিল, সে যেহেতু যুদ্ধবন্দি ছিল,

সেকারণেই এ নির্দেশ জারী করা হয়। যাহোক, তার জীবন রক্ষা পাওয়ার ছিল, তাই অন্য কারো হাতে ধরা না পড়ে সে মহানবী (সা.) এর হাতেই ধরা পড়ে। কিন্তু তাকে পেয়েও তিনি (সা.) হত্যা করেন নি। তবে অন্য কোন সাহাবীর হাতে ধরা পড়লে অবশ্যই তাকে হত্যা করতো। যেহেতু মহানবী (সা.) এর হাতে ধরা পড়েছে তাই তিনি (সা.) তাকে হত্যা করেন নি।"

[এই হলো আদর্শ আর তাঁর এই আদর্শ সেসকল সীমালঙ্ঘনকারীদের আপত্তির উত্তর, যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি নাকি অন্যায় করেছেন, আর হত্যা ও রক্তপাত ঘটিয়েছেন। অথচ যে হত্যার দোষে হত্যাযোগ্য ছিল আর যার শাস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তও হয়ে গিয়েছিল, সেই ব্যক্তিও যখন তাঁর কাছে ধরা পড়ে, তাকেও তিনি (সা.) হত্যা করেন নি।] "একটি ঘটনা অনুসারে সোহাইলকে মহানবী (সা.) পেয়েছেন বাবলা গাছের ঝোপের ভিতর। এতে মহানবী (সা.) নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাকে ধরে ফেল তার হাত তার ঘাড়ের সাথে বেধে দেয়া হয় অর্থাৎ তাকে বন্দি করা হয়।" (তারিখে দামেষ্ক লে ইবনে আসাকার, ১২তম খণ্ড, ২৪ অধ্যায়, পৃ: ৩৩৩, সাহিল বিন আমর বিন আব্দুশ সামস, বৈরুতে মুদ্রিত)

সহিহ বুখারী শরীফে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত উতবান বিন মালেক মহানবী (সা.)-এর সেসব আনসারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে, আমি আমার লোকদের নামায পড়াই। যখন বৃষ্টি হয় তখন সেই নর্দমায় ঢল নামে যা আমার এবং তাদের বসতির মাঝে অবস্থিত, যার ফলে তাদের মসজিদে এসে আমি নামায পড়াতে পারি না। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার বাসনা হলো, আপনি আমার বাড়িতে আসুন আর আমার ঘরে নামায পড়ুন, তাহলে আমি সেটিকে মসজিদ হিসেবে অবলম্বন করব। মহানবী (সা.) বলেন, ইনশাআল্লাহ, আমি আসব। তিনি বলতেন যে, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) প্রভাতে সূর্যোদয়ের পর একদিন আমাদের পাড়ায় আসেন। আর তিনি (সা.) অনুমতি চান, আমি অনুমতি দেই। তিনি (সা.) ঘরে এসে আসন গ্রহণ করেন নি বরং বলেন, কোন জায়গায় তুমি চাও যে, আমি যেন সেখানে নামায পড়ি? তিনি বলেন, আমি ঘরের একটি কোণার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে দেখিয়ে দেই যে, আমি চাই আপনি ওখানে নামায পড়ুন। মহানবী (সা.) নামাযের জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে যান আর নামায পড়েন এবং আল্লাহু আকবার বলেন। আমরাও সেখানে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হই। তিনি (সা.) দুই রাকাত নামায পড়েন, এরপর সালাম ফেরান। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খাজিরা (অর্থাৎ মাংস আর আটা দ্বারা প্রস্তুতকৃত এক প্রকার খাবার) তাঁর (সা.) সামনে উপস্থাপনের মানসে তাঁকে বসতে বলি, যা তাঁর জন্য আমরা প্রস্তুত করেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, ঘরে পাড়ার কিছু লোকও সমবেত হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে কোন একজন বলেন, মালেক বিন আদ্ দুখশুম কোথায়? তখন তাদের একজন বলেন, সে তো মুনাফেক, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালোবাসে না। সেই এলাকাতেই যেহেতু তিনি থাকতেন তাই তার না আসাতে হয়ত কেউ এমন মন্তব্য করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, এমনটি বলো না, তোমরা কি দেখ না সে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** পড়েছে আর এর মাধ্যমে সে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি সন্ধান করে। এতে সেই ব্যক্তি

বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। পুনরায় সেই ব্যক্তি বলেন, আমরাতো মুনাফেকদের প্রতি তার মনোযোগ এবং হিতাকাঙ্খা লক্ষ্য করি। (হয়ত হৃদয়ের কোমলতার কারণে তিনি মুনাফেকদের তবলীগ করতে চাইতেন আর তাদেরকে ইসলামের দিকে টেনে আনতে চাইতেন, তাই তাদের প্রতি সহানুভূতিও রাখতেন। এই কারণে হয়ত সাহাবীদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।) মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই সে ব্যক্তির জন্য অগ্নিকে হারাম করে দিয়েছেন যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দেয়। কিন্তু শর্ত হলো এ ঘোষণার মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টির সন্ধান।" (সহিহ্ বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাব আল্ মাসাজিদ ফিল্ বায়ত, হাদীস নং ৪২৫)

সুতরাং এটি হলো সেই সব নামধারী আলেমদের (কথার) খণ্ডন, যারা কুফরি ফতোয়া প্রদান করে থাকে আর বিশেষ করে তাদের যারা আহমদীদের ওপর জুলুম এবং অত্যাচার করে। এই নামধারী আলেমদের ফতোয়াই মুসলমান দেশগুলোর শান্তিকে পদদলিত করে রেখেছে। আজকাল পাকিস্তানে 'লাব্বায়েক ইয়া রাসূলুল্লাহ্' নামে একটি সংগঠন রয়েছে। তারা 'লাব্বায়েক ইয়া রসূলুল্লাহ্'র নারাবাজি করে থাকে অথচ রসূলুল্লাহ্র উক্তি হলো যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে তাকে তুমি এটি বলবে না যে, তুমি মুসলমান নও। খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কেউ যদি এমনটি বলে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য অগ্নি হারাম করে দিয়েছেন। আর এরা বলে যে, না, তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দিচ্ছ না। হৃদয়ের খবর এরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকেও যেন বেশি জানে। আল্লাহ্ তা'লা এদের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করুন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত এতবান বিন মালেক (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হযরত মালেক বিন আদ্ দুখশুম হলো মুনাফিক। এতে মহানবী (সা.) বলেন, সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য দেয় না? এতবান উত্তরে বলেন, কেন নয়, কিন্তু তার এ সাক্ষ্য কোন অর্থ রাখে না। এতে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কি নামায পড়ে না? তিনি বলেন, কেন নয় কিন্তু **'লা সালাতা লাহু'** অর্থাৎ তার নামায কোন নামায নয়। (হয়তো তাদের কতকের মাঝেও আজকালকার মৌলভীদের মত কঠোরতা কিছুটা ছিল।) মহানবী (সা.) বলেন, এরাই সেসব লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিজের পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বারণ করেছেন।" (ওসোদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩০, মালেক বিন আদ্ দুখশুম, ২০০৩ সালে বৈরুতে মুদ্রিত) হৃদয়ের অবস্থা কেবল আল্লাহ্ই জানেন।

মহানবী (সা.)-কে তো আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন কিন্তু এসব আলেম বিশেষ করে পাকিস্তানী আলেমদের কথা অনুসারে তাদের কাছে আল্লাহ্র নামে অত্যাচার-অবিচারের লাইসেন্স বা সনদ রয়েছে।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সামনে হযরত মালেক বিন আদ্ দুখশুম (রা.) সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলায় মহানবী (সা.) বলেন, **'লা তাসুব্বু আসহাবী'** অর্থাৎ তোমরা আমার সাথিদেরকে গালমন্দ করবে না। (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৬, মালেক বিন আদ্ দুখশুম, ২০০২ সালে বৈরুতে মুদ্রিত)

মহানবী (সা.) তবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় মদীনা থেকে কিছু দূরে 'যু-আওয়ান' নামক স্থানে অবস্থান করেন। তখন মসজিদে যিরার সম্পর্কে তাঁর প্রতি ওহী

অবতীর্ণ হয়। তিনি হযরত মালেক বিন আদ্ দুখশুম এবং হযরত মা'ন বিন আদী'কে ডেকে পাঠান আর মসজিদে যিরারের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত মালেক বিন দুখশুম এবং হযরত মা'ন বিন আদী দ্রুত বনু সালেম গোত্রে পৌঁছেন, যা হযরত মালেক বিন দুখশুমের গোত্র ছিল। হযরত মালেক বিন আদ্ দুখশুম হযরত মা'নকে বলেন যে, আমায় কিছুটা সময় দিন, আমি ঘর থেকে আগুন নিয়ে আসি। অতএব তিনি ঘর থেকে খেজুরের শুষ্ক পাতায় আগুন লাগিয়ে নিয়ে আসেন, এরপর তারা উভয়েই মসজিদে যিরারে যান। অপর এক বর্ণনা অনুসারে মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে তারা সেখানে পৌঁছেন আর সেখানে গিয়ে আগুন ধরিয়ে সেটিকে ভস্মীভূত করেন।" (শারায়ে যুরকানী, আলা মুয়াহেবুল লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৭-৯৮, বাব গাযওয়া তাবুক, ১৯৯৬ সালে বৈরুতে মুদ্রিত)

অতএব কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে এমন সাহাবীদের সম্পর্কে আমরা ভুল ধারণা করতে পারি না। যার (অর্থাৎ হযরত মালেক বিন আদ্ দুখশুম) সম্পর্কে কতক লোকের ধারণা ছিল যে, হয়তো তিনি ভুল পথে চলে গেছেন, এমনকি কেউ কেউ তাকে মুনাফেকও আখ্যা দেয় কিন্তু ইনিই পরবর্তীতে খোদার নির্দেশে মুনাফেকদের কেন্দ্রকে ধ্বংস করার এবং ধূলিস্যাৎ করার কারণ হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন আর আমাদেরকেও এই আত্মজিজ্ঞাসার তৌফিক দান করুন যে, খোদার আদেশ নিষেধ বা শিক্ষামালা আমরা কতটা বাস্তবায়ন করছি। (আমীন)

**(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১-৭ জুন ২০১৮, খণ্ডঃ ২৫, সংখ্যাঃ ২২, পৃঃ ৫-৮)**

**(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)**